আজকের কাগজ

তারিখ 11 MAY 1992
পৃষ্ঠা 8 কলাম

পাবলিক পরীক্ষায় নকলের উৎপত্তি এবং ভাবিত জাতি

মোহাম্মদ ইসমাইল

পাবলিক পরীক্ষায় নকল একটি সামাজিক সমস্যা। সামাজিক বিবর্তনের এক পর্যায়ে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে তার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান শতকের ষাট দশকের মাঝামাঝি কেউ পরীক্ষার হলে ম্যাজিস্ট্রেট দেখেননি। ম্যাজিস্ট্রেট আসছে এমন কথাও বোধ হয় কেহ শুনেননি। তখন পরীক্ষা পরিচালনা করতেন শিক্ষকরা। পরীক্ষা হলের সীমানায় নির্দিষ্ট দূরত্বে পুলিশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেতো।

একসময় নকল ছিল গুটিকতক ছাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং খুব গোপনে তা সংগঠিত হতো। স্বাধীনতার পরে বৃহত্তর ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে তার বিস্তৃতি লাভ করে এবং শিক্ষকসহ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণ তাতে অংশগ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। ষাট দশকের শেষের দিক পর্যন্ত যা ছিল অতি নিন্দনীয় সেই কাজটি ১৯৭০-এর পরে সাধারণ আচরণে রূপান্তরিত হলো। পিতাকে পুত্রের জন্য এবং পুত্রকে পিতার জন্য নকল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা গেল।

এর অনেক কারণ ছিল। পাকিস্তান আমলের শেষে দিকে থানা পর্যায়ে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন ছিল সম্ভবতঃ এর প্রধান কারণ। ঐ সময়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ স্থানীয় গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা এবং শিক্ষাবিস্তারের স্বার্থে থানাপর্যায়ে পাবলিক পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের যুক্তি দেখিয়ে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করলেও অসদুপায় অবলম্বনের মাধ্যমে তারা তাদের সন্তানদের জন্য ভাল ফলাফল অনেকটা নিশ্চিত করে নেন। যাদের নামে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল তাদের লাভের অংশটা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। যাহোক, এ পর্যায়ে পরীক্ষায় নকল 'গণটোকাটুকি' তে রূপ নিতে আরম্ভ করে।

১৯৭১ সালের পরে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে থানায় থানায় পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয় এবং রাতারাতি থানাপর্যায়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়ে যায়। কোন কোন থানায় ৩/৪টি পর্যন্ত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলশ্রুতিতে অতি অল্প দিনের মধ্যে থানা সদরে কলেজ পর্যায়ের পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে নকল আরও বিস্তৃতি লাভ করে। পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র সংলগ্ন ঝোপ-জঙ্গল এমন কি খোলা মাঠেও 'নকল কেন্দ্র' স্থাপিত হয়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকরা পর্যন্ত নকল সরবরাহের জন্য পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শহরাঞ্চল থেকে নিজ নিজ এলাকায় চলে যেতে থাকেন। এ অবস্থা চলার ফলে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই পরীক্ষায় পাসের হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামাঞ্চলে নামসর্বস্ব ডিগ্রীধারীদের সংখ্যা পূর্বের তুলনায় হঠাৎ করে বেড়ে যায়।

এ পরিস্থিতি নব্য ডিগ্রীধারী যুবকদেরকে চাকুরী প্রদান এবং তথাকথিত শিক্ষাবিস্তারের নামে গ্রামে গ্রামে আরও নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়ক হয়ে উঠে। এক শ্রেণীর সমাজ সেবক এবং রাজনীতিবিদ সবদিক বিবেচনা না করে স্ব স্ব এলাকায় নতুন নতুন স্কুল, কলেজ স্থাপনে পাল্লা দেন। এরও কিছুদিন পরে ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের নামে দেশের আনাচে-কানাচে আলীয়া মাদ্রাসা স্থাপনের প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে সরকার কর্তৃক উল্লেখযোগ্য হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান আরম্ভ হলে এ প্রতিযোগিতা আরও বেড়ে যায়। তাছাড়া এ ধরনের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে স্কুল, মাদ্রাসা এবং কলেজের শিক্ষকদের চাকুরী পূর্বের তুলনায় অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

কিন্তু প্রতিটি এলাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় এদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী যোগাড় করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। ফলে যারা পড়াশুনায় আগ্রহী নয় তাদেরকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নামমাত্র শিক্ষার্থী হিসাবে ভর্তি করা হয় এবং এদের পাসের উপরে প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল বলে শিক্ষকদের উপর এদেরকে পাস করানোর দায়-দায়িত্ব বর্তায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শিক্ষাদানের মাধ্যমে পাস করানোর দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা না নিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার কারণে নকল সরবরাহের সহজ পন্থার মাধ্যমে এদেরকে পাস করানোর প্রচেষ্টায় শিক্ষকরা আগ্রহী হয়ে উঠেন। নকল সরবরাহে সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি এ সব শিক্ষকগণ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শহরে বসবাসরত গ্রামের এককালীন বাসিন্দাদের বখাটে বা দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডের সন্তানদেরকে গ্রামীণ পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উন্নত ফলাফল এবং আর্থিক লাভ এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এ গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা নকল করাকে অনেকটা তাদের অধিকার বলে ধরে নেয়। ফলে সার্বিকভাবে গ্রামীণ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল একটি অতিসাধারণ বিষয়ে পরিণত হয় যা প্রতিরোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পারিপার্শিক অবস্থার পরিবর্তন না হওয়ার কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল এভাবে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। নকল একটি 'দুষ্ট চক্রে' পরিণত হয়। আজও শিক্ষাঙ্গন এ চক্র থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি।

এখানে উল্লেখ্য যে, শহরে শিক্ষিত শ্রেণীর বসবাস এবং সেখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে অনেকটা আর্থিক সংগতিসম্পন্ন বিধায় সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরকে নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে তাদের গ্রামীণ সহকর্মীদের সহযাত্রী হতে হয়নি। তাছাড়া শহরে স্বার্থসচেতন অভিভাবকগণ তাদের পুত্র-কন্যাদের উন্নত ভবিষ্যতের আশায় সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। নকল এ পথে বাধা, তা এ শ্রেণীটি অনুধাবন করে ফেলেন সহজেই। ফলে নগর এলাকায় নকল ক্রমান্বয় কমতে থাকে। পরিস্থিতি ভিন্ন বিধায় পূর্বে বর্ণিত কারণে গ্রামাঞ্চলে নকল দুষ্টচক্রের আবর্তে ঘুরতে থাকে। এ কারণে গ্রামীণ এবং শহরে শিক্ষার মান দুটো ভিন্নমুখী ধারায় প্রবাহিত হয়। এর ফলে সকলের অলক্ষ্যে এক অশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

নকলের সাহায্যে ভাল ফল করা সম্ভবপর হয় বলে গ্রামীণ কিশোর-কিশোরীরা পড়াশুনায় স্বাভাবিকভাবেই অমনোযোগী হয়। পক্ষান্তরে তাদের শহরে বন্ধুরা উন্নত ভবিষ্যতের আশায় শিক্ষিত অভিভাবক এবং গৃহ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে অধিকমাত্রায় পড়াশুনা করে। নকলের কারণে গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীদের কারও কারও ফলাফল দৃশ্যতঃ শহরে ছাত্র-ছাত্রীদের সমপর্যায়ের হলেও প্রকৃত শিক্ষার অভাবে পরবর্তীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকে থেকে উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং উর্ধ্বতন চাকুরী লাভে তারা ব্যর্থ হয়। এভাবে 'সহজলভ্য নকল' তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে চিরদিনের মত বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ অবস্থায়, জাতীয় জীবন থেকে কলঙ্ক দূরীকরণের স্বার্থেই নকল প্রতিরোধ করার প্রয়োজন দেখা দেয়নি বরং গ্রামাঞ্চলের গরীব কৃষককুলের শিক্ষিত সন্তানদের শিক্ষা এবং চাকুরীতে তাদের ন্যায্য হিস্যা প্রদানের স্বার্থেও শিক্ষাঙ্গন থেকে নকল দূরীকরণের প্রচেষ্টা নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রামাঞ্চল থেকে নকল দূরীকরণ সম্ভব না হলে গ্রামীণ যুব শ্রেণীর জন্যে উপরে উঠার সিঁড়ি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যাবে। শিক্ষা, বৈভব, প্রতিপত্তি শহরে বাবুদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। নতুন সামাজিক মেরুকরণ হবে এবং পরিণতিতে সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসবে।

সম্প্রতি সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কক্ষে আলোচনাকালে শুনলাম একটি উপজেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঐ উপজেলায় মোট জনসংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। এটা কতটা সত্য তা পরীক্ষা করে দেখিনি। তবে এতে যে সত্যতা রয়েছে তা আমার নিজ এলাকায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দেখে অনুমান করতে পারি। গত কয়েক বছরে শিক্ষা দপ্তরের একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তায় মাত্র পাঁচশত গজ ব্যাসার্ধের একটি ছোট এলাকায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা এবং বালিকা মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। এদের খাতায় দেখানো সংখ্যা যোগ করা হলে এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এলাকার জনসংখ্যার চেয়ে শুধু দ্বিগুণ নয় বরং কয়েকগুণ বেশী হবে নিঃসন্দেহে। প্রকৃতপক্ষে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর যে সংখ্যা দেখানো হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা।

ছাত্র-ছাত্রীর প্রকৃত সংখ্যা যা হোক না কেন, সরকার থেকে এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীগণ প্রতিমাসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাচ্ছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডিগ্রী থাকলেও এদের শিক্ষার মান আশানুরূপ এবং গ্রহণযোগ্য নয়। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা পাসের তাই একমাত্র ভরসা নকল এবং এ কারণেই প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া নকল দূরীকরণ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

শিক্ষা বিষয়ক সার্বিক সংস্কার একটি জটিল এবং সময়সাপেক্ষ কাজ। তবে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাগ্রহণ করা হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে এবং শিক্ষাঙ্গন থেকে নকল বহুলাংশে দূর হবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিটি উপজেলার বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার হিসাব সরকারের নিকট রয়েছে। কোন্ পর্যায়ের কতজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন তা নির্ধারণ করাও সম্ভব। সে হিসাব মতে, প্রতিটি উপজেলায় কোন্ ধরনের কতটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে সরকার তা স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারেন। সংখ্যা নির্ধারণের পর স্থানীয় প্রশাসন এবং গণপ্রতিনিধিদের সহায়তায় বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য থেকে বিভিন্ন দিক বাছাই করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রেখে অন্যসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হবে। ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান পুনঃনির্ধারণেরও প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজনানুসারে ভবিষ্যতে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে।

এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদেরকেও নতুন যাচাই-বাছাই-এর আওতায় আনতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, গ্রামীণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অযোগ্য শিক্ষকের আধিক্য রয়েছে। সরকারী অর্থে এদেরকে চাকুরীতে রাখার কোন যুক্তি নেই। তাই প্রতি জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত বাছাই কমিটি গঠনপূর্বক যথাযথ বাছাইয়ের মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।

এ পদক্ষেপ নেয়া হলে কিছুসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হতে পারেন। এর ফলে আপাততঃ হৈচৈ পড়ে গেলেও কিছুদিনের মধ্যেই অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে যাবে। কারণ শিক্ষক ছাঁটাইয়ের ফলে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার অধীনে অবশিষ্ট সকল শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি না করে সরকারী তহবিল থেকে বর্তমান ৮০%-এর পরিবর্তে ১০০% বেতন প্রদান করা সম্ভব হবে।

এ পদ্ধতি গ্রহণ করা হলে শিক্ষকদের আর্থিক অনিশ্চয়তা থাকবে না এবং তাদেরকে বর্তমানের মত নকলের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাস করানোর দায়িত্ব নিতে হবে না। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকা থাকবে বিধায় পড়াশুনার মান উন্নত হবে। ফলে শহর অঞ্চলের মত গ্রামাঞ্চলেও নকলের প্রবণতা কমে যাবে।

এ মৌলিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে শিক্ষাঙ্গন থেকে নকল চিরদিনের মত বিদায় নেবে এবং ফলে নকলের কারণে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনে যেসব সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে বলে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে তা দূরীভূত হবে। আমাদের হাতে সময় নেই। এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে নকল দূরীকরণ তথা শিক্ষার মান উন্নত করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।

মোহাম্মদ ইসমাইলঃ লেখক, কলামিস্ট